দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি

- English

দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক মুক্তবাণিজ্য চুক্তি (সাফটা) সার্কচুক্তিভুক্ত দেশসমুহের মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকেই সংক্ষেপে এবং ইংরেজিতে সাফটা (SAFTA) বলা হয়। ২০০৪ সালের জানুয়ারি মাসে ইসলামাবাদে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সাফটা চুক্তির পূর্বে বাণিজ্য সংক্রান্ত আরেকটি চুক্তি ১৯৯৩ সালে ঢাকায় স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এ চুক্তিটি ইংরেজিতে SAARC Preferential Trading Arrangement সংক্ষেপে SAPTA (সাপটা) নামে অভিহিত। সাপটার আওতায় চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের মধ্যে বাণিজ্য উদারিকরণ সংক্রান্ত কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করার বিধান রাখা হয়েছিল।

সাপটার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, (ক) সবধরনের উৎপাদিত পণ্য বাণিজ্যের আওতাভুক্ত করা, (খ) অনুন্নত দেশসমূহের জন্য বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা। এর মধ্যে প্রধান ছিল পণ্যভিত্তিক সমকক্ষতার ভিত্তিতে সুবিধা প্রদান। সব পণ্যের জন্য শুল্কহ্রাস, খাতভিত্তিক পণ্যের আদান-প্রদান এবং প্রত্যক্ষ বাণিজ্য সংক্রান্ত পদক্ষেপসমূহ। এছাড়াও ছিল বাণিজ্যের ভারসাম্যহীনতার ক্ষতিকর দিক প্রতিরোধ এবং রুলস অব অরিজিন সংক্রান্ত সুবিধাজনক পদক্ষেপ।

সাপটার আওতায় সর্বমোট চার দফায় সুবিধাদি প্রদান করা হয়। এ চার দফার প্রথম দফায় ২২৬টি পণ্য সংক্রান্ত সুবিধাদি দ্বিতীয় দফায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৭১ পণ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। এর মধ্যে অনুন্নত দেশের জন্য শুল্কভার হ্রাসসহ শুল্কবহির্ভূত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের ব্যবস্থাও অর্ন্তভূক্ত ছিল। তৃতীয় দফায় পণ্যভিত্তিক সমকক্ষতার ভিত্তিতে পণ্য আদানপ্রদানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এর ফলে চুক্তির আওতাভুক্ত পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ২০০২ সালে চতুর্থ দফায় বাংলাদেশকে ২৫৮ টি পণ্যের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করা হয়।

সাপটা কাঠামো বর্হিভূত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির আওতায় ভারত বাংলাদেশকে ৭৯টি পণ্যের জন্য শুল্কমুক্ত বাণিজ্য সুবিধা প্রদান করে। সংখ্যাভিত্তিক বাধাসহ পাকিস্তানও কাঁচাপাট ও চা রপ্তানির জন্য সুবিধা প্রদানে সম্মত হয়।

সাপটার অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো ছিল: (১) পণ্যভিত্তিক সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়ায় সময়সাপেক্ষের জটিলতা এবং এ জন্য এ ব্যবস্থার বদলে নিষিদ্ধ পণ্য তালিকা প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা, (২) উল্লেখযোগ্য হারে শুল্কহ্রাসে অবাধ বাণিজ্যের সম্প্রসারণ সম্ভব নয়, (৩) আঞ্চলিক বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে শুল্কবহির্ভূত প্রতিবন্ধকতার সম্পূর্ণ বিলুপ্তি, (৪) চুক্তিভূক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য সংক্রান্ত সক্ষমতা বৃদ্ধি যার অভাবে বিভিন্ন দেশের বিদ্যমান বিধিবিধানের আওতাভূক্ত নির্দিষ্ট মান সঠিকভাবে মেটানো সম্ভব নয় এবং (৫) পণ্য সংক্রান্ত রুলস অব অরিজিনকে এমনভাবে বিন্যাস করা যার ফলে বাণিজ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া ছিল দেশভিত্তিক বাণিজ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি যার ফলে চুক্তিবদ্ধ পণ্য অন্যদিকে প্রবাহিত না হয় এবং আন্তঃআঞ্চলিক বিনিয়োগের সুবিধা প্রদান, (৫) প্রয়োজনীয় সরবরাহ নিশ্চিতকরণ চুক্তির আওতাভূক্ত সদস্য দেশসমূহের রপ্তানিযোগ্য পণ্যের উৎপাদন সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং রপ্তানি কাঠামোর বহুমুখিকরণ যার ফলে আঞ্চলিক বাণিজ্যের গভীরতা অর্জন করা সম্ভব হয় এবং (৬) বাণিজ্য সংক্রান্ত সুবিধাদির সহজ লভ্যতা।

সকল আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে ২০০৬ সালের পহেলা জানুয়ারি সাফটা চুক্তি বলবৎ করা হয়। সার্ক সচিবালয় থেকে এ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়। এ চুক্তির মাধ্যমে সাপটা চুক্তি বাতিল করা হয়। বিনিয়োগ, উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাবনার প্রসার, বাণিজ্যের প্রসার ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহযোগিতার মাধ্যমে সার্কদেশভুক্ত দেশসমূহের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করাই সাফটার প্রধান উদ্দেশ্য। সাফটা চুক্তির ভূমিকায়ও সুবিধাজনক বাণিজ্য ব্যবস্থায় সদস্যভুক্ত দেশসমূহে আন্তঃসীমান্ত পণ্য আদান প্রদানের অসুবিধা দূরীকরণের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার অভিপ্রায় ও প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি স্পষ্টভাবে স্বীকার করা হয়েছে।

২৫ অনুচ্ছেদ সম্বলিত সাফটা চুক্তিতে নিম্নোক্ত চারটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চিহ্নিত করা হয়েছে:

এক. চুক্তিভূুক্ত সদস্যদেশসমূহের বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ ও এসকল দেশে আন্তঃসীমানা পণ্য আদানপ্রদানের প্রবাহকে সহায়তা প্রদান;

দুই. এ সকল দেশে স্বকীয় অর্থনৈতিক অবস্থার আলোকে মুক্তবাণিজ্য এলাকাভূক্ত অঞ্চলে ন্যায্য প্রতিযোগিতার এবং পক্ষপাতমুক্ত ও ন্যায়বিচারপূর্ণ সুবিধাদির প্রবর্তন:

তিন. সাফটাচুক্তির বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, যুগ্ম ব্যবস্থাপনা এবং বিরোধের নিষ্পত্তি;

চার. আঞ্চলিক সহযোগিতার অধিকতর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন এবং পারস্পরিক সুবিধাদি বৃদ্ধি।

সাফটা চুক্তিতে ছয়টি নীতির উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে:

(ক) চুক্তিটি বাস্তবায়িত হবে এর বিভিন্ন ধারা এবং চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের সম্মতিক্রমে গৃহীত বিধিবিধান, সিদ্ধান্ত, সমঝোতা ও স্বাক্ষরিত প্রোটকলের মাধ্যমে;

(খ) বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার মারাকেশ চুক্তির এবং চুক্তিবদ্ধ দেশসমুহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত অন্যান্য চুক্তির আওতাভূক্ত অধিকার ও দায়দায়িত্ব অক্ষুন্ন থাকবে;

(গ) চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহের স্বকীয় অর্থনৈতিক ও শিল্প উন্নয়নের পর্যায়, বৈদেশিক বাণিজ্যের ধারা এবং শুল্কহারের নীতি ও পদ্ধতির ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক ন্যায়বিচারপূর্ণ সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য সাফটা চুক্তি প্রয়োগ করা হবে;

(ঘ) সাফটার আওতাভূুক্ত দেশসমূহের মধ্যে অবাধে পণ্য চলাচল নিশ্চিত করা হবে। এ ধরনের চলাচল শুল্কহার, আধা-শুল্কহার এবং অশুল্ক বিষয়ক বাধানিষেধ এবং সমতুল্য বিষয় প্রত্যাহারের মাধ্যমে করা হবে;

(ঙ) চুক্তিভূুক্ত দেশসমূহ বাণিজ্যের প্রসার সহায়ক ও প্রাসঙ্গিক অন্যান্য পদক্ষেপ গ্রহণ করবে যার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আইনি কাঠামোকে পর্যায়ক্রমে সমতুল্য করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

(চ) পারস্পরিক সুবিধা বর্হিভুত ভিত্তিতে চুক্তিভূুক্ত অঞ্চলের চিহ্নিত অনুন্নত দেশের জন্য বিশেষ এবং কার্যকরী বাণিজ্য প্রসার সম্পর্কিত সুবিধাদির বিষয়টি পারস্পরিক স্বীকৃতি দেয়া হবে।

সর্বোপরি একটি অর্থনৈতিক সংঘ প্রতিষ্ঠাই সাফটার রূপকল্পে স্বীকৃতি পাবে। এতদঞ্চলের দেশসমূহের বাণিজ্য বিষয়ক পারস্পরিক সংঘাত নিঃসন্দেহে এ রূপকল্প বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টি করবে এবং বর্তমানেও এই অবস্থা বিরাজমান। অনেকগুলো সমান্তরাল পরিপূরক বিষয় বাণিজ্য সহযোগিতার সীমানার বাইরে রয়েছে। এজন্য চুক্তির বিভিন্ন দিক সম্পর্কিত বিষয়গুলো অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো: (ক) বাণিজ্য উদারীকরণ পরিকল্পনা (TLP), (খ) পণ্যের রুলস অব অরিজিন (RoO) এবং রাজস্ব ক্ষতিপূরণের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়া। বাণিজ্য উদারীকরণ বিষয়ের মধ্যে মূলতঃ পণ্য সম্পর্কিত তিনটি তালিকা প্রণয়নের বিষয় রয়েছে: (১) নিষিদ্ধ তালিকাকে সময়ে সময়ে সংবেদনশীল তালিকা নামেও অভিহিত করা হয়। (২) মুক্ত তালিকা যে তালিকাভুক্ত পণ্যের জন্য সম্পূর্ণ শুল্ক প্রত্যাহার অথবা নগণ্য শুল্কহার আরোপ করার বিষয়টি গ্রহণযোগ্য হবে এবং (৩) অবশিষ্ট তালিকা যে তালিকাভুক্ত পণ্যে শুল্কহ্রাসের বিষয়টি প্রযোজ্য হবে।

নিষিদ্ধ তালিকা হচ্ছে আমদানি নিষিদ্ধ তালিকা। এ তালিকা প্রণয়নের ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ অবয়বের মধ্যে ভারসাম্য আনার বিষয়টিই ছিল মুখ্য সমস্যা। কারণ, এ তালিকা দীর্ঘ হলে তা মুক্ত বাণিজ্য ধারণার সাথে অসংগতিপূর্ণ হবে। এ ভারসাম্য রক্ষায় সদস্যভুক্ত দেশসমূহের বাণিজ্য প্রসার বিষয়ক পারস্পরিক স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি বিষয় চুক্তি চূড়ান্তকরণ প্রক্রিয়ায় দেখা দেয়। এর মধ্যে রয়েছে, (ক) রাজস্বের ক্ষতিপূরণ, (খ) গুরুত্বপূর্ণ দেশজ শিল্পের সুরক্ষা, (গ) ভিনদেশে বাণিজ্যের প্রবাহ রোধ, (ঘ) খামার ও বৃহৎ শিল্পের স্বার্থ রক্ষা, (ঙ) ভোক্তার স্বার্থ এবং (চ) উৎপাদনের ধাপ।

RoO এর বিষয়টি সবার জন্য গ্রহণযোগ্য করার বিষয়ে চুক্তিভূক্ত দেশের পারস্পরিক স্বার্থের দন্দ্ব ও আশঙ্কা নিরসন করার বিষয়টিই মূখ্য সমস্যা ছিল। অনুন্নত দেশগুলো নমনীয় করার পক্ষে ছিল। তবে ভারত ও পাকিস্তানের মতো উন্নয়নশীল দেশ এ বিষয়টির উপর কড়াকড়ি করার পক্ষে ছিল, কারণ এর মাধ্যমেই এ দেশগুলো স্বীয় স্বার্থ সংরক্ষণ করতে সক্ষম। অন্য জটিল বিষয়টি ছিল বাণিজ্য উদারীকরণ পদ্ধতি নির্ধারণ।

দীর্ঘ আলোচনার পর একমত হয়ে সাফটা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। বিশ্লেষণমূলক গবেষণায় দেখা যায়, শেষ পর্যন্ত সাফটা চুক্তির ফলে চুক্তিভূক্ত দেশসমূহে বাণিজ্যের প্রসার ঘটে নি। দেখা যায় যে, এ চুক্তির বাস্তবায়ন বাণিজ্য উদারীকরণ পরিকল্পনার মধ্যে সীমিত। এর ফলে বাণিজ্যের পরিধি ও পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নি। মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়তে কয়েকটি পরিপূরক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, অশুল্ক বিষয়ক সকল বাধার বিলুপ্তি, বাণিজ্য ও শুল্ক সম্পর্কিত সুবিধাদি, এবং বাণিজ্য সহায়ক সামর্থ্য বৃদ্ধি।